

Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা বানান সমন্বয় : মূলনীতি ও দ্বন্দ্ব

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tariq Manzoor
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.6
Pages	১০৩-১১৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা বানান সমন্বয় : মূলনীতি ও দ্বন্দ্ব

তারিক মনজুর*

সার-সংক্ষেপ : বাংলা বানান বিষয়ে আলোচনা চলে আসছে দুশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। মূলত ছাপাখানায় বাংলা ভাষা প্রবেশের পর থেকেই বানান সমন্বয়ের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৬ সালের প্রস্তাবের অনেক আগে থেকেই এই নিয়ে পণ্ডিতি তর্ক চলতে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা বানান সমন্বয়ের মূলনীতি ও এ-বিষয়ক দ্বন্দ্বের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বানানের রীতি ও নিয়মের ক্ষেত্রে যে ধারা বা স্রোত হাল আমলে এসে পৌঁছেছে, তা উচ্চারণকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিতে চায়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা বানানকে পুরোপুরি উচ্চারণ-অনুগ করে তোলা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি এই ভাষার অধিকাংশ শব্দকে সংস্কৃতমূল ধরে বানান-পদ্ধতিকে নিখাদ ব্যুৎপত্তিমূলক রাখাও অসম্ভব। সুতরাং প্রচলনকে গুরুত্ব দিয়ে বানানের জন্য সমন্বিত মূলনীতি নির্ধারণ করা এখনকার প্রধান সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১.

মুদ্রণকাজের জন্য ধাতুতে বাংলা বর্ণমালা গঠিত হওয়ার সময় অন্তত দুটি বিষয়ের মীমাংসা জরুরি হয়ে পড়ে : এক, বাংলালিপির নির্দিষ্ট আকৃতি ও কাঠামো নির্ধারণ করা; দুই, পুস্তকের জন্য 'মান বানান' নিরূপণ করা। হস্তলিপির ভিন্নতা ও সৌকর্য বাংলা বর্ণের ছাপা-উপযোগী কাঠামো প্রদানের পথে বাধা হতে পারেনি। কিন্তু লিপিকর ভেদে বানান-পার্থক্যের সমন্বয়সাধন আয়াসসাধ্য ছিল।

হাতের লেখা থেকে মুদ্রণযন্ত্রে ভাষার লিখিত রূপ প্রবেশ করার সাথে সাথে বানানের কিছু সংস্কার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। মধ্যযুগীয় বাংলা শব্দে বানানের বৈচিত্র্য ছিল; একে সমন্বিত করা ছিল প্রথম কাজ। সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি-নির্ভর বানান গড়ে তোলার প্রবণতা মূলত এখান থেকেই শুরু। বাংলা বানানের রূপ ব্যুৎপত্তিমূলক হবে, নাকি একে উচ্চারণানুগ করা হবে, অথবা বানানে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদ্যমান মিশ্র-রূপকে অবিকৃত রাখা হবে -- এই ত্রিধারিক তর্ক বাংলা বানানকে সুস্থিত থাকতে দেয়নি। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বানান ও উচ্চারণানুগ বানানের সমন্বয়কে বাংলা বানানের মূল সমস্যা বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

পৃথিবীতে ভাষা-পরিবারের মূল ভাষাই হোক আর শাখা ভাষাই হোক, সব ভাষাই প্রথমে মুখে প্রচারিত হয়। এভাবে মৌখিকভাবে চলতে চলতে ওই ভাষা মানুষের নানা প্রয়োজনে একসময় লেখ্যরূপ পায় (প্রফুল্লকুমার, ২০০৬ : ভূমিকা ছ)। যে-ভাষার শুধু মৌখিক রূপ রয়েছে, সেটির জন্য বানান-সমস্যা দেখা দেওয়ার কারণ নেই। কিন্তু মুখের ভাষা লিখিত রূপ পাওয়ার পর একই শব্দের বানানে বিভিন্ন রূপ তৈরি হতে পারে; একে সমন্বিত করাই কঠিন কাজ হয়ে যায়।

পবিত্র সরকার (২০০৭ : ২৭২) বলেন, একটা ভাষা অনেকগুলো স্থানীয় ও শ্রেণিগত-গোষ্ঠীগত মৌখিক ভাষার গুচ্ছ -- বাংলা ভাষাও তাই। উপভাষা ও সমাজভাষা – dialect ও sociolect—এ দুটিকে একসঙ্গে ধরে নিয়ে বলা হয় 'উপ-সমাজভাষা' বা dia-sociolect। এইসব উপ-সমাজভাষার মধ্যে কেবল এর মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড রূপটিই প্রধানত লেখা হয়। আর ভাষা যতক্ষণ লিখিত রূপ না পায়, ততক্ষণ তার শব্দাবলির বানান-নির্ধারণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। লিপি ও বানান সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত মূলত ভাষার 'লিখিত' রূপ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত।

অস্থায়ী ধ্বনির স্থায়ী বর্ণন বা বর্ণায়ন থেকেই 'বানান' কথাটির উদ্ভব (মিতালী, ২০১০ : ভূমিকা ১)। ধ্বনির বর্ণন বা বর্ণায়ন খুব সহজ ব্যাপার নয়। এতে নানা দিক থেকে নানা সমস্যা তৈরি হয়। প্রথমত, প্রায় সব ভাষাতেই মুখের ধ্বনির সঙ্গে তার বর্ণমালার পারস্পরিক সমরূপতা সবক্ষেত্রে থাকে না। যেমন, বাংলা ভাষায় এমন ধ্বনি আছে, যার প্রতিনিধিত্বকারী বর্ণ এর বর্ণমালায় নেই, আবার বাংলা ভাষার বর্ণমালায় এমন বর্ণ আছে যার ধ্বনিগত পার্থক্য নেই অন্য বর্ণ থেকে। দ্বিতীয়ত, যে ভাষার দীর্ঘদিনের লিখিত ইতিহাস আছে, সেখানে সমস্যা তৈরি হয় আর এক দিক থেকে। কারণ, ভাষার ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যে গতিতে বদলায়, সেই ধ্বনিপরিবর্তনের গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারে না লিখিত রূপের জন্য ব্যবহৃত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ। ফলে ধ্বনিবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাসের মধ্যে একটা ব্যবধান তৈরি হতে থাকে। তৃতীয়ত, আর একটা সমস্যা দেখা দেয় ভাষার ভৌগোলিক ও সামাজিক আঞ্চলিকতা নিয়ে। প্রশ্ন ওঠে, এই ধরনের আঞ্চলিক ধ্বনির বহু-বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনটিকে সর্বজনগ্রাহ্য হিসেবে মেনে নেওয়া হবে; কিংবা তার সর্বজনগ্রাহ্য বর্ণায়নই-বা কেমন হওয়া উচিত। চতুর্থত, অন্য ভাষার শব্দকে যখন গ্রহীতা ভাষায় লিখে দেখানোর প্রয়োজন হয়, তখন অনেক ক্ষেত্রেই বর্ণায়নের ক্ষেত্রে দুই ভাষার ধ্বনি-বর্ণের মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্যের অভাব দেখা দেয়। বর্ণায়নটি কেমন হবে বা হতে পারে – তা নিয়েও বানান-চিন্তকদের মধ্যে মতভেদ তৈরি হয়। অন্য অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাও

অনেক দিন ধরে লেখা হয়ে আসছে। তাই বর্ণায়নের প্রায় সবকয়টি সমস্যাই বাংলা ভাষার লিখিত রূপের ক্ষেত্রে দেখা দেয়।

২. বাংলা বানান সমন্বয় : দ্বন্দ্বের স্বরূপ

মনসুর মুসা (২০০৭) মনে করেন, বাংলা বানান বিষয়ক আলোচনার গোড়ায় একটি তাত্ত্বিক সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে সংগুপ্ত আছে। এর সমাধান না হওয়ার ফলে বানান-বিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি অস্পষ্টতা রয়ে যাচ্ছে। তিনি এটিকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে, 'বাঙলা ভাষায় শব্দের জাতবিচার সম্পর্কিত তাত্ত্বিক সমস্যাই বাঙলা বানানের নিয়মের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে' (মনসুর ২০০৭ : মলাট)। তাঁর মতে, তৎসম-অতৎসম বিভাজনের ভেতরে 'ভাষা-সংগঠনগত সৌসাদৃশ্য' কতটা কাজ করে তা কখনোই তলিয়ে দেখা হয় না। তাছাড়া অনেক শব্দের জাত-বিচারের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। ফলে তৎসম ও অতৎসম দ্বিবিভাজন (dichotomy) ব্যবহার করে বানানের যে নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তা বিধান হিসেবে সঠিক হয়নি।

বাংলা ভাষার গঠনে যেসব উপাদান আছে, তার অনেক অংশই সংস্কৃত থেকে গৃহীত। পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই পূর্বসূরী ভাষাপ্রকৃতির থেকে এইভাবে উপাদান গ্রহণ করে। সুধাংশুশেখর তুঙ্গা (২০০৫ : ১৮৩) বলেন, আধুনিক কালের শিক্ষাদীক্ষার বাংলা ভাষা থেকে সংস্কৃত শব্দ বর্জন করতে হবে বা সংস্কৃত প্রভাব এড়িয়ে চলতে হবে– এমন নির্দেশ নিতান্ত অযৌক্তিক এবং সেজন্য তা মান্য করা যায় না।

আবার মৃণাল নাথ (২০০৫ : ২৩৭) বলছেন, বহুল প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে বানান-বিধায়কেরা সংস্কৃত অভিধান থেকে 'অযথা' কিছু বিকল্প তুলে এনে জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে, এমন জটিলতা বানান সংস্কারে অযথা বিশৃঙ্খলা আনে; কারণ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিকল্পবর্জন, অর্থাৎ সমতা-সাধন। যে শব্দ যে বানানে, যেভাবে বহুল প্রচলিত (এমনকি ভুল হলেও), তা গ্রহণ করাই ভাষাচর্চাকারীর কাজ।

কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩২৪) বলছেন, 'মায়ের পেট থেকে প'ড়েই কোনো বাচ্চা তো জেনে যায় না যে এটা তৎসম, অবিকল সংস্কৃতের মতো, অতএব এখানে ঈ-কার ঊ-কার হবে, ওটা তদ্ভব, সংস্কৃত থেকে ভেঙেচুরে বেরিয়েছে, ওখানে হবে ই-কার উ-কার। তেমন নিয়ম তো তার কাছে arbitrary-ই'। তিনি ঈ ও তার কারচিহ্ন হ্রাসের ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলছেন, 'যে একবার বুঝে গেছে যে 'হাতী' এসেছে 'হস্তী' থেকে, 'পাখী' 'পক্ষী' থেকে, 'কুম্ভীর' 'কুমীর' থেকে, সে ইহজন্মে ভুলবে না। ঐ যুগলগুলোতে ব্যঞ্জনবর্ণের সাদৃশ্য ছাড়াও ঈ-কারের উপস্থিতি তাকে নকশাটা মনে রাখতে সাহায্য করে' (২০০৫ : ৩২৫)। তাঁর মতে, ঈ-কারের (এবং

ঊ-কারের) প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'অ্যালার্জি' এবং তিরিশের দশকের বানান-কমিটি কর্তৃক সেই 'অ্যালার্জিকে প্রশ্রয়দান' (অর্থাৎ, তদ্ভব শব্দে বিকল্পে 'ই', 'উ'-র জন্য অনুমোদন) বাংলার স্বাভাবিক প্যারাডাইমকে 'এলোমেলো, রাহুগ্রস্ত, ভাঙাচোরা' করে দিয়েছে। তিনি বলেন, বানানে একটা সুস্পষ্ট প্যারাডাইম-চেতনা বা লজিক ছিল : কর্ণ থেকে কাণ, চূর্ণ থেকে চূণ, পর্ণ থেকে পাণ, বর্ণন থেকে বাণান, কোণ থেকে কোণা ইত্যাদি। (কেতকী ২০০৫ : ৩৪১)

মোহাম্মদ আজমের মতে, ব্যুৎপত্তি-অনুসারী আর উচ্চারণ-অনুসারী—এ দুইয়ের মিশ্রণের কারণে বাংলা বানান-পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল রয়ে গেছে। তিনি মনে করেন, তৎসম শব্দের জন্য এক বিধি আর অন্য শব্দের জন্য অন্য বিধি প্রণয়নের ফলে জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা বেড়েছে (আজম ২০১৪ : ৪৬১)। বাংলা বানান সমন্বয়ের কাজে তর্ক আবর্তিত হয়েছে মূলত তৎসম আর অতৎসম শব্দের বিভাজনে। অভিধান-রচয়িতাদের মধ্যে তৎসম-অতৎসম মতভেদ প্রবল — 'যে-শব্দকে কোনো অভিধানে তৎসম বলা হয়েছে, সেই শব্দকেই হয়তো অন্য অভিধানে তদ্ভব বা এমনকী কখনো বিদেশী বলে গণ্য করা হয়েছে' (অরুণ ১৯৯৬ : ৬৪)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোনটি তৎসম আর কোনটি অতৎসম – তা শনাক্তের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই মতবিরোধ রয়েছে। আবার যে শব্দগুলো তৎসম বলে বিবেচিত, সেগুলোর বানানেও বিকল্প দেখা যায়।

দেবপ্রসাদ ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্যদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্‌ভব শব্দে অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে – কিছু কিছু চালাচ্ছিও। যেখানে মতে মিলছি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানছি' (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৯)। তদ্ভব শব্দের উচ্চারণভিত্তিক বা ধ্বনিসঙ্গত বানানের জন্য প্রায় একটা আন্দোলন তৈরি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, তৎসম শব্দে 'কৃত্রিম দলিলের জোরে' 'পুরাতত্ত্বঘটিত প্রমাণ রক্ষা'র জন্য এই (ধ্বনি) সঙ্গতি অগ্রাহ্য হয়েছে; কিন্তু 'উচ্চারণের সঙ্গে মিল করে প্রাকৃত বাংলার (অর্থাৎ অতৎসম শব্দের) বানান অপেক্ষাকৃত নিরাপদে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে' (রবীন্দ্রনাথ ২০১২/১৬ : ৪৩৫)। এক্ষেত্রে তাঁকে প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা দেবপ্রসাদ ঘোষ থেকে শুরু করে অনেকের। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৪ : ৫৪৪) তো কঠোরতর ভাষা ব্যবহার করে উচ্চারণভিত্তিক বানানকে বলেছিলেন 'কদর্য বাণান'।

বাংলা বানানের বর্তমানই বলে দিচ্ছে, এখানে রক্ষণশীলতা ও সংস্কার দুটোই ক্রিয়াশীল। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের বানানে যদিও রক্ষণশীল মূলানুগ নীতি গৃহীত; কিন্তু সেখানেও যেসব শব্দে বিকল্প আছে, তার মধ্যে থেকে উচ্চারণরীতি মান্য করে

একটিকে নির্বাচন করা হয়। অতৎসম শব্দেও উচ্চারণকে কতকক্ষেত্রে যেমন মানা হয়, তেমনি বহুক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়বোধে কিছু-কিছু উচ্চারণজ্ঞাপক চিহ্ন বর্জিত হয়। উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তি দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছে বাংলা বানানে – এটাই এর বাস্তবতা ও ভবিতব্য।

৩. বাংলা বানান সমন্বয়ের মূলনীতি

বাংলা ভাষায় যেসব শব্দ আছে, তার অনেকগুলোই ভিন্ন-ভিন্ন বানানে লেখা যায় এবং লেখা হয়। অরুণ সেন (১৯৯৬ : ৯) প্রশ্ন তুলেছেন, 'এই যে একই শব্দ ভিন্ন-ভিন্ন বানানে লেখা হয় এবং সেগুলোর কোনোটারই বানান যাকে বলে অশুদ্ধ তা বলা যায় না, প্রত্যেকটির পেছনেই থাকে নিজস্ব যুক্তি বা নিয়ম, তাতে ওইসব শব্দের সর্বসম্মত ও সর্বমান্য একটি বানানে পৌঁছানো কি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়?'

বানানে বিকল্পের অস্তিত্ব যেমন স্বীকার করে নিতে হয়, তেমনি স্বীকার করে নেওয়া উচিত একে বর্জন করে একক বানানে পৌঁছানোর ইচ্ছা বা উদ্যোগকে। বানান-সংস্কারের একটা ইতিহাস বা পরম্পরা তৈরি হয়ে গেছে; একে অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ, নানা জায়গা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সরলীকরণ বা সমতাবিধানের নানা বিপরীতমুখী প্রস্তাব (এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে ব্যবহার বা অভ্যাস) চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা বাড়ারই সম্ভাবনা।

এ-বিষয়ে যাঁরা মনোযোগী তাঁরা বুঝেছেন, এক-এক শব্দের ক্ষেত্রে এক-এক যুক্তি বড় হয়ে উঠছে। তাই নিয়মও আর সরল থাকছে না, জটিল হয়ে পড়েছে। যেমন, সংস্কৃত ভাষার একটি অতি-নিরূপিত ব্যাকরণ আছে এবং বাংলা ভাষার বহু শব্দই সরাসরি সংস্কৃত থেকে আসা। সেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারেই শব্দের বানান লেখা হয়। কিন্তু অনেকে এসব শব্দের জন্যও উচ্চারণ-অনুগ বা উচ্চারণের কাছাকাছি বানান চান। আবার যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে, সেসব শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম সাধারণত মানা হয় না। অতৎসম শব্দে মূলত উচ্চারণ অনুসারেই বানান লেখা হয়। কিন্তু অতৎসম কোনো-কোনো শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বানানে উচ্চারণ মানা হচ্ছে না, হয়তো সংস্কৃত নিয়ম মান্য করা হচ্ছে; কিংবা তৃতীয় কোনো বানানকে মেনে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃত অভিধানের নিয়ম, উচ্চারণের নিয়ম, প্রচলন-নির্ভর নিয়ম – সব নিয়মের মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছে (কিংবা করে চলেছে) বাংলা বানান। অরুণ সেন (১৯৯৬ : ২৮) বলেন, 'বাংলা বানানের এই নৈরাজ্যের জন্য লেখকের অসচেতনতা বা ঔদাস্যই শুধু দায়ী নয়, নৈরাজ্যের বীজ পোঁতা আছে বাংলা ভাষার স্বভাব ও বাংলা বানানের প্রকৃতির মধ্যেও। বাংলা ভাষার বিকাশ ও বাংলা শব্দভাণ্ডারের বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে বানানের এই জটিল বহুমুখিতা ওই নৈরাজ্যকে খানিকটা যেন অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।'

পৃথিবীর সব আধুনিক ভাষাতেই মৌলিক এবং আগন্তুক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ইতিহাসে যেভাবে ঘটেছে তা অন্যত্র তুলনীয় নয়। এখানে বানানের যে জটিলতা তৈরি হয়েছে – তা এই ইতিহাসের কারণেই এবং তা এই ভাষারই নিজস্ব। এর সমাধানও তাই হতে হবে এই নিজস্বতাকে মেনে নিয়ে।

৩.১ সংস্কৃত বনাম বাংলা : দ্বিমুখীন তর্ক

বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অসরল এবং দ্বিস্তরিক। বাংলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা – জন্মসূত্রে যে যোগই থাকুক, এর ধ্বনিতত্ত্ব-রূপতত্ত্ব-বাক্যগঠন-শব্দভাণ্ডার সবই আলাদা।[১] অন্যদিকে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃতের একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, অন্তত এ কারণে যে এর শব্দভাণ্ডারের একটি বিপুল অংশ সংস্কৃত থেকে প্রায় অপরিবর্তিতভাবে নেওয়া। যে-কারণে এই শব্দগুলোকে বলা হয় তৎসম। তাছাড়া সন্ধি-সমাস-উপসর্গ-প্রত্যয় ইত্যাদি নানা সূত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা বানানের সংযোগ রয়েছে। অথচ বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দের উচ্চারণ প্রায়শ মূলের মতো নয়। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, 'ভেবে দেখলে বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দ একেবারেই নেই' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/১৬ : ৪৫৩)। অথচ এই উচ্চারণ প্রকাশ করে যে-চিহ্নগুলো (ঈ-কার, ঊ-কার ইত্যাদি) বা বর্ণ (যেমন – ণ, ষ), তা মোটামুটি অবিকল রয়ে গেছে।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ ছাড়াও রয়েছে বিপুল পরিমাণে অতৎসম শব্দ। মনে হতে পারে, এই শব্দগুলো যেহেতু সংস্কৃতের চিহ্ন ও উচ্চারণ-বিধি নিয়ে অবিকল আসেনি, অতএব এখানে বাংলা উচ্চারণ অনুসারে বানান লেখা যাবে। কিন্তু এখানেও ব্যাপারটা এত সহজ থাকেনি। কারণ অতৎসম শব্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তদ্ভব শব্দ, যে-শব্দ আদতে তৎসমই ছিল, কিন্তু নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন চেহারায় বাংলায় এসেছে। এগুলোকে সংস্কৃতবিধি অনুসারে, অর্থাৎ মূল-শব্দ বা উৎস-শব্দের বানান অনুসারে লেখা হবে, না সম্পূর্ণ নতুন শব্দ হিসেবে গণ্য করে বাস্তব উচ্চারণকে মেনে নেওয়া হবে বানানে – এ নিয়ে প্রশ্ন, বাক্‌বিতণ্ডা ও মতভেদ থাকা সম্ভব এবং তা রয়েছেও। অতৎসম শব্দের অন্য দুটি উপাদান — দেশি এবং বিদেশি শব্দ নিয়েও সমস্যা রয়েছে। এই সমস্যা শব্দের মূল উচ্চারণ ও প্রচলিত বানান নিয়ে, যুক্তাক্ষর ও হসচিহ্নের ব্যবহার নিয়ে; এমনকি ণত্ব-ষত্ব বিধান বা সংস্কৃত বানানবিধির অন্য নানা সূত্র এখানেও প্রযোজ্য হবে কি-না তা নিয়েও মতভেদ তৈরি হয়েছে।

মন্মথনাথ বসু (২০০৭ : ২৪৩-২৪৪) বলতে চান, সংস্কৃত থেকে যে আমরা বাংলা ভাষার উৎপত্তি ধরে নিচ্ছি এখানেই 'গোড়ায় গলদ'। প্রাকৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষা জন্মেছে; আর এ ভাষা আদতে সংস্কৃত ভাষা নয়। তিনি পণ্ডিত Rhys David-এর

মত উল্লেখ করে বলেন, সংস্কৃত ভাষা কোনোকালেই কথিত ভাষা ছিল না; চিরকালই এটা ছিল পণ্ডিতজনের লেখার ভাষা। আবার Prof. Rapson প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি এ মত খণ্ডন করেছেন। দুপক্ষে এখনও তুমুল তর্ক চলছে – নিশ্চিত হয়ে কোনো মতকে এখনও অবলম্বন করা যায় না। মন্মথ বসু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এরকম দুর্বল ভিত্তির ওপর বাংলা বানানের কাঠামো দাঁড়াতে পারে না। অতএব, যে ভাষা কখনও চলতি বা কথ্য ছিল কি-না এরই সন্দেহ, সেটির নিয়মে একটা জীবন্ত ভাষাকে চালানোর চেষ্টা করা হলে আমাদেরকে ইতিহাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে চলতে হবে এবং শেষে 'পস্তাতে' হবে।

আবার, কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫ : ৩২৩) বলছেন, সংস্কৃত আর বাংলা নিশ্চয়ই দুটো আলাদা ভাষা, ঠিক যেমন সন্তান বাবা-মায়ের থেকে আলাদা – পৃথক একটি ব্যক্তিত্ব। কিন্তু প্রথমত, বাংলালিপি নাগরি-বংশোদ্ভূত; এই লিপিতে স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত লেখা যায়, এবং লেখা হত; তাই সংস্কৃতর সঙ্গে বাংলার বন্ধনটা দৃঢ়। দ্বিতীয়ত, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে এত বেশি তৎসম আর তদ্ভব শব্দ আছে যে সংস্কৃতের সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক আবশ্যিকভাবে অচ্ছেদ্য।

এই দ্বিমুখীন তর্ক বাংলা বানানে প্রভাব ফেলেছে এবং বিকল্পের সুযোগ করে দিয়েছে বা বিকল্পের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

৩.২ বানানরীতি বনাম আঞ্চলিক ভাষা

চলিতভাষা হল মুখের ভাষা। কিন্তু এখন যাকে চলিতভাষা বলা হচ্ছে, তারও পৃথক ইতিহাস রয়েছে। সেটা ঠিক দৈনন্দিন ব্যবহারের মুখের ভাষা নয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষার কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ রেখে বহুকাল থেকেই কথ্যভাষাকে মোটামুটি পাঁচটি প্রধান আঞ্চলিক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে – রাঢ়ি, বঙ্গালি, বরেন্দ্রি, কামরূপি ও ঝাড়খণ্ডি। এগুলোকে বলা হচ্ছে বাংলার আঞ্চলিক উপভাষা (Regional dialect)। এগুলোর মধ্যে 'পূর্বি' হল রাঢ়ির অন্তর্গত। এটি মূলত মধ্য পশ্চিমবঙ্গের উপভাষা – বিশেষ করে কলকাতার উপভাষা – যা ইতিহাসের ধারায় ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে। কারণ ব্রিটিশ আমল থেকেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে কলকাতা হয়ে উঠেছিল বাংলার প্রাণকেন্দ্র। তাই প্রথমে মূলত কলকাতার উপভাষার ওপর ভিত্তি করেই একটি সর্ববঙ্গীয় কথ্য বাংলা গড়ে উঠেছিল (রামেশ্বর, ২০০৫ : ২০০)। এই ভাষার সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দ[২] লিখেছিলেন : 'যদি বল ও-কথা বেশ; বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকাতার ভাষা।' প্রমথ চৌধুরী (১৯৯৮ : ২৬৭) অবশ্য সাহিত্যের লিখিত রূপ হিসেবে মুখের ভাষাকে আনতে চান

এবং এজন্য যুক্তি দিয়ে অঞ্চল নির্দেশ করছেন এভাবে – নদীয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, ভাগীরথীর উভয় কূল এবং বর্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণাংশ।

যখন চলিতভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস দেখা দিল, তখন খানিকটা স্বাভাবিকভাবে আপনা থেকেই এবং খানিকটা পরিকল্পিতভাবে সাহিত্যিক আন্দোলনের মাধ্যমে চলিতভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। ধীরে ধীরে তা মার্জিত হয়ে ওঠে এবং সাহিত্যে ব্যবহারের উপযোগী প্রায় সর্ববঙ্গীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা পায়। ক্রমে আঞ্চলিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে এই ভাষা সর্বজনীন আদর্শ বা মান্য-রূপ লাভ করে। একেই আমরা বলি আদর্শ বা মান্য চলিত বাংলা (Standard Colloquial Bengali = SCB)।

প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'প্রাদেশিক ভাষা, অর্থাৎ dialect, এই নাম শুনলেই আমাদের ভীত হবার কোনো কারণ নেই। সম্ভবত এক সংস্কৃত ব্যতীত গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি মৃত ভাষাসকল এক সময়ে লোকের মুখের ভাষা ছিল। এবং সেই সেই ভাষার সাহিত্য সেই যুগের লেখকেরা 'যচ্ছুতং তল্লিখিতং' এই উপায়েই গড়ে তুলেছেন' (প্রমথ, ১৯৯৮ : ২৬৬)। তিনি আরও বলেন, আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যও মৌখিক ভাষার অনুসারে লেখা হয়ে থাকে। আর পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানকার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের লোকেরা ঠিক সমভাবে কথা বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিত ভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিত ভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে – একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল ভেদ ছিল, এখন তাহা প্রতিদিন ঘুচিয়া আসিতেছে' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১২/৯ : ৪২০)। একই শব্দের অঞ্চল ভেদে নানা উচ্চারণ থাকতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক শব্দের ক্ষেত্রে সবাই (রবীন্দ্রনাথ তো বটেই) উচ্চারণমূলক বানানকেই মেনে নিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে উচ্চারণের আদর্শায়িত মান বা Standard নির্ধারণই বড় সমস্যা।

৪. ধ্বনিমূলক বানান ও ব্যুৎপত্তিমূলক বানানের তুলনা

শেষ পর্যন্ত বাংলা বানানের ধারা উচ্চারণভিত্তিক হবে, নাকি ব্যুৎপত্তিমূলক; কিংবা বলা যায় অধিকতর প্রাধান্য থাকবে কোনটির – এই মীমাংসায় আসা প্রয়োজন। বাংলা বানানের মূলনীতি নির্ধারণের জন্যই এটি জরুরি। আদতে পৃথিবীর লিখিত কোনো ভাষার বানান পুরোপুরি ধ্বনিমূলক নয়, আবার পুরোপুরি মূলানুগ নয়।

স্বরোচিষ সরকার (২০১৫ : ১৫১) বলেন, বানান প্রমিতকরণ প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হল – শব্দের বিকল্পহীন বানান প্রতিষ্ঠা করা। বাংলা ভাষায় এটি সম্পূর্ণ বিশ শতকীয় উদ্যোগ। ১৯২৫ সালে এর জন্য বিশ্বভারতী একটি বানানবিধি প্রণয়ন করে এবং ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রণয়ন করে বানানের নিয়ম। উদ্যোগ দুটিকে ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বানানের বিধি প্রণীত হয়।

৪.১ ধ্বনিমূলক বানান-পদ্ধতি

বর্ণের দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রধান আশ্রয় মুদ্রিত শব্দে (word) এবং শ্রুতিগোচর রূপটি পরিস্ফুট হয় উচ্চারণে। দানীউল হক (১৯৯২ : ১৫১-১৫২) লিখছেন, বাংলা ভাষার লিপিপদ্ধতি অর্থাৎ বর্ণমালা ধ্বনিমূলীয় (Phonemic) এবং শব্দের-ক্ষেত্রে বিন্যাসের দিক থেকে তা অক্ষরমূলক (Syllabic)। এ কথার অর্থ হল, বাংলা বর্ণের সাহায্যে যা লেখা হয় তার প্রতিটি 'সিলেবল' দ্বারা সুনির্দিষ্ট ধ্বনিমূলক একক-বিভাজন ঘটে এবং সাধারণভাবে দল-বন্ধন দ্বারা এক বা একাধিক ধ্বনিমূলক একক (বর্ণ) উচ্চারিত হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম ও অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে, বর্ণ দ্বারা যে বানান লেখা হয়, উচ্চারণে তা সবসময় পুরোপুরি অনুসৃত হয় না; অথবা বলা চলে যা উচ্চারিত হয়, বানানে তা সবক্ষেত্রে উচ্চারণানুগ লিপিবদ্ধ হয় না।[৩] বাংলা আসলে ভারতীয় অনেক ভাষার মতোই phonemo-syllabic and consistent।

উচ্চারণ ও বানানকে ঘিরে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে যেসব ধ্বনি ও বর্ণকে নিয়ে, তার সংখ্যাও নেহাত কম নয়[৪] : (১) অ–অভিশ্রুত ও'–হসন্ত; (২) হ্রস্ব ই–দীর্ঘ ঈ; (৩) হ্রস্ব উ–দীর্ঘ ঊ; (৪) ঋ/ঋ-কার–রি/র-ফলা; (৫) এ–এ্যা; (৬) ঐ–অই–ওই; (৭) ঔ–অউ –ওউ; (৮) ক্ষ–খ; (৯) ঙ–ং; (১০) জ–য–Z; (১১) ঞ; (১২) ণ–ন; (১৩) বর্গীয় ব–অন্তঃস্থ ব; (১৪) শ–ষ–স। এগুলোর বাইরেও যেসব ধ্বনি ও বর্ণকে ঘিরে বিতর্ক রয়ে গেছে, সেগুলোকে আমরা গৌণ বিবেচনা করছি।

বাংলা বানানে যেমন একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণচিহ্নের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, তেমনি একাধিক ধ্বনির জন্য একই চিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যেমন – আমরা অ-স্বরকে কখনও অ-এর মতো, কখনও ও-এর মতো উচ্চারণ করি। আবার শ-ধ্বনির জন্য কখনও শ, কখনও ষ, কখনও স লিখি। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে এই প্রতিরূপ সম্পর্কের অভাব কেবল বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে নয়, পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত ভাষাতেও লক্ষ করা যায়। বানান ও উচ্চারণের মধ্যে অন্য একটি পার্থক্য হল – বানান একটি লিখন-প্রক্রিয়া, অন্যদিকে উচ্চারণ একটি বাচন-প্রক্রিয়া। একটি ভাষাসম্প্রদায়ের সুধীসমাজে সাধারণত একটি অভিন্ন বানান-রীতি অনুসরণ করা হয় বা অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু অঞ্চলভেদে উচ্চারণভেদ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এ-কার বাংলা বর্ণমালার সর্বাধিক ব্যবহৃত চিহ্ন। শব্দের আদিতে এ অথবা এ-কারের উচ্চারণে দুটি স্বর আছে। একটি স্বকীয় এবং অপরটি বিবৃত। ঘের, জেরা, ফেরা, শেখা, সেরা শব্দে এ-কারের উচ্চারণ প্রকৃত। কিন্তু খেলা, ঠেলা, দেখা, বেচা শব্দে এ-কারের উচ্চারণ বিবৃত। এ এবং এ-কারের বিবৃত উচ্চারণ বোঝাবার জন্য

সাধারণত অ্যা, এ্যা অথবা ্যা-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতান*-এ এ-কারের বিবৃত স্বর বোঝাবার জন্য মাত্রাসহ এ-কার (ে) এবং প্রকৃত স্বর বোঝাবার জন্য মাত্রা ছাড়া এ-কার (ে) চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানে '*সে যেতে যেতে চেয়ে গেল কী যেন গেয়ে গেল*' কলিতে সে, যেতে, চেয়ে এবং গেয়ে শব্দে এ-কারের উচ্চরণ প্রকৃত এবং গেল ও যেন শব্দে এ-কারের উচ্চারণ বিবৃত। ফলে এ-কারের চিহ্ন দুই জায়গায় দুইরকম ব্যবহৃত হয়েছে।

বাংলা শব্দ (word)-এর উচ্চারণ ক্ষেত্রবিশেষে ধ্বনির অনুরূপ না হয়ে বিশেষ পদ্ধতি মেনে চলে। একে সূত্রবদ্ধও করা হয়েছে। জামিল চৌধুরী (১৯৯০ : ৯৫-১০৩) বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণকে সূত্রবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন, যুক্তরূপে অনেক সময়ে ঞ ণ ম য ব (অন্তঃস্থ ব) শ ষ স এবং হ-এর ধ্বনিতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অঞ্চল, বাঞ্ছা, অঞ্জলি, ঝঞ্ঝা এবং যাচ্ঞা শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে অন্‌চল্, বান্‌ছা, অন্‌জোলি, ঝন্‌ঝা এবং যাচ্‌না। কিন্তু জ্ + ঞ = জ্ঞ যুক্তবর্ণের উচ্চারণ পদের আদিতে অনেকটা য়াঁ-স্বরাশ্রিত গ-এর মতো এবং পদমধ্যে বা শেষে এই যুক্তবর্ণের উচ্চারণ অনেকটা য়াঁ-স্বরাশ্রিত গ্‌গ-এর মতো। যেমন – জ্ঞাত (গ্যাঁতো), জ্ঞান (গ্যাঁন্), কিন্তু অজ্ঞাত (অগ্‌গ্যাঁতো), অজ্ঞান (অগ্‌গ্যাঁন্), বিজ্ঞ (বিগ্‌গোঁ) ইত্যাদি।

পদের মধ্যে অথবা শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জনের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত করলে উচ্চারণে ওই-ব্যঞ্জনের ধ্বনিদ্বিত্ব হয়। যেমন – অকাট্য (অকাট্‌টো), অদ্য (ওদ্‌দো), অন্য (ওন্‌নো), উদ্যম (উদ্‌দম্), উদ্যোক্তা (উদ্‌দোক্‌তা), গণ্য (গোন্‌নো), তথ্য (তোত্‌থো), বিবেচ্য (বিবেচ্‌চো), সত্য (শোত্‌তো)। আবার, পদের প্রথম বর্ণে য-ফলা যুক্ত হলে বর্ণের উচ্চারণ দুরকম হতে পারে। প্রথমত, পদের প্রথম বর্ণে অ অথবা আ-স্বর থাকলে ওই বর্ণের য-ফলাযুক্ত বানানে সাধারণত অ্যা-ধ্বনি উচ্চারিত হয়; যেমন – খ্যাত, জ্যামিতি, ত্যাগী, ধ্যান, ন্যস্ত, ন্যায়, ব্যক্ত, ব্যথা, ব্যবহার, ব্যাকুল, ব্যবহারিক। দ্বিতীয়ত, পদের প্রথম বর্ণে অ-স্বর থাকলে এবং পরবর্তী বর্ণে ই অথবা উ-স্বর থাকলে ওই বর্ণের য-ফলাযুক্ত বানানে প্রকৃত এ-ধ্বনি পাওয়া যায়; যেমন – ব্যক্তি (বেক্‌তি), ব্যতিক্রম (বেতিক্‌ক্রোম্), ব্যতীত (বেতিতো), ব্যতিরেক (বেতিরেক্), ব্যথিত (বেথিতো)। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় 'ব্যভিচার' শব্দে (ব্যাভিচার্)। কিন্তু পদের প্রথম বর্ণে অ এবং আ-স্বর ব্যতীত অন্য স্বর যুক্ত থাকলে, য-ফলার প্রভাবে উচ্চারণে সে বর্ণের ধ্বনিতে কোনো পরিবর্তন হয় না, কেবল ঈষৎ ঝোঁক পড়ে; যেমন – চ্যুত (চুতো), দ্যুতি (দুতি)।

জামিল চৌধুরী (১৯৯০) য-ফলার মতো ব-ফলারও উচ্চারণসূত্র নির্দেশ করেছেন। পদের প্রথম বর্ণে অন্তঃস্থ ব যুক্ত হলে উচ্চারণে ওই বর্ণের ধ্বনিতে কোনো পরিবর্তন

হয় না, উচ্চারণে কেবল প্রথম বর্ণের ধ্বনিতে কিঞ্চিৎ ঝোঁক পড়ে; যেমন – ক্বচিৎ (কোচিত্), জ্বালা (জালা), ত্বরা (তরা), দ্বিপদ (দিপদ্), ধ্বনি (ধোনি), শ্বাপদ (শাপদ্), স্বভাব (শভাব্)। আবার, পদের মধ্যে বা শেষে কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে অন্তঃস্থ ব যুক্ত হলে উচ্চারণে ওই ব্যঞ্জনের ধ্বনিদ্বিত্ব হয় এবং ব্যঞ্জনের অ-স্বর সংবৃত হয়; যেমন – অশ্ব (অশ্‌শো), কণ্ব (কন্‌নো),পক্ব (পক্‌কো), পল্বল (পল্‌লোল্), পৃথ্বী (পৃত্‌থি)। অন্যদিকে, যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে অন্তঃস্থ ব যুক্ত হলে ওই ব্যঞ্জনের উচ্চারণে অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে। যেমন – উচ্ছ্বাস (উচ্‌ছাশ্), উজ্জ্বল (উজ্‌জল্), দ্বন্দ্ব (দন্‌দো)। এদিকে, 'উৎ' উপসর্গের সঙ্গে অন্তঃস্থ ব যুক্ত করে গঠিত সংযুক্তবর্ণে ব-এর উচ্চারণ লুপ্ত হয় না; যেমন – উদ্বায়ী (উদ্‌বায়ি), উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্তু), উদ্বাহন (উদ্‌বাহোন্), উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্), উদ্বোধন (উদ্‌বোধন্), উদ্বৃত্ত (উদ্‌বৃত্তো)।

বাংলায় পদের মধ্যে বা শেষে ক্ষ-র উচ্চারণ ক্‌খ-এর মতো; যেমন – পরীক্ষা (পোরিক্‌খা), রক্ষক (রোক্‌খোক্)। আর, পদের আরম্ভে ক্ষ-র উচ্চারণ অনেকটা খ-এর মতো; যেমন – ক্ষমা (খমা), ক্ষীণ (খিনো)।

শ্রীবি (২০০৭ : ৩১৫) জানাচ্ছেন, ইংল্যান্ডে কিছু লোক ইংরেজি শব্দকে উচ্চারণ-অনুসারে বর্ণবিন্যাস করার চেষ্টা করেছেন। এভাবে 'ফনেটিক সিস্‌টেম'-এ বানান লেখার চেষ্টায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। এই চেষ্টা ও উদ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, বর্ণমালার অভাবে ভাষায় কী অকথ্য বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে। তাঁর মতে, বাংলা বর্ণমালা যদি পরিবর্ধিত না করা হয়, তবে আধুনিক ইংরেজরা উচ্চারণ নিয়ে যে গোলযোগে পড়েছেন, ভবিষ্যত বাঙালিরা ততদূর না হোক, কিন্তু তদ্রূপ এক গোলযোগে পড়তে পারে। উচ্চারণমূলক বর্ণমালার স্বার্থে তিনি যেমন বর্ণসংখ্যা বাড়ানোর পক্ষপাতী; আবার, একই কারণে, অনুরূপ উচ্চারিত বর্ণসমূহও হ্রাস করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

৪.২ ব্যুৎপত্তিমূলক বানান-পদ্ধতি

ব্যুৎপত্তিগত বানান আমাদেরকে সংস্কৃত-মুখাপেক্ষী করে রেখেছে; অথচ বাংলা ভাষার জন্ম সংস্কৃত ভাষা থেকে হয়নি। আত্মা, পদ্ম, বৃক্ষ – এরকম অসংখ্য বানান আমরা সংস্কৃত অনুসারে লিখলেও উচ্চারণ করি বাংলায়।

বাংলা বানানকে উচ্চারণ-অনুযায়ী লেখার পক্ষপাতী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[৫] (২০১২/১৩ : ৫৯৯) :

> বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন-কি, কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনই সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষায় বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ নির্দেশ করেছেন শতকরা ৪৪টি (Chatterji 2002 : 218)। এই সংখ্যাগত হার নির্দেশে তিনি যে সময়ের সাহিত্যকে বিচার করেছিলেন, সেই সময়কে বিবেচনায় রেখেই বলা যায়, বাংলা ভাষায় তৎসম শব্দ এখনও সংখ্যাগুরু। রবীন্দ্রনাথও (২০১২/১৩ : ৫৮৪) স্বীকার করেছেন, 'সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলাভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে।' বাংলা সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষা – এই যুক্তিতে সংস্কৃত থেকে শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিংবা সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয় সহযোগে নতুন শব্দ গঠনের ব্যাপারে সমর্থন লক্ষ করা গিয়েছিল উনিশ শতকের আগে থেকেই।

মোহাম্মদ আজম (২০১৪) বলেন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত গদ্যগ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ধার করা হয়েছে। এসব শব্দ লেখা হয়েছে সংস্কৃতরীতিতে। তাতে বানানে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু বানান হয়ে উঠেছে অধিকতর ব্যুৎপত্তি-অনুসারী। অথচ মধ্যযুগে বাংলা বানান ছিল মূলত উচ্চারণ-অনুসারী। আজম (২০১৪ : ১৭৪) মনে করেন, সমস্যা আরও বড় হয়ে উঠেছে উনিশ শতকের শুরুতেই যখন প্রচলিত 'তৎসম' শব্দগুলোর মধ্যযুগে-প্রচলিত রূপকে বিবেচনায় না নিয়ে মূল সংস্কৃতের সঙ্গে মিলিয়ে বানান ঠিক করা হয়েছে। তাছাড়া তদ্ভব ও অন্য শ্রেণির শব্দের ক্ষেত্রেও বানানকে সংস্কৃত-অনুসারী করার প্রবণতা ছিল অতি প্রবল।

এই প্রবণতা উচ্চারণের সঙ্গে বানানের ব্যবধান তৈরি করে দিয়েছে – এমনকি সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রেও। কারণ, সংস্কৃত অনুযায়ী এই বানান ঠিক করা হলেও বাঙালির মুখে শব্দগুলোর উচ্চারণের রূপ বদলে গেছে। 'As regards the pronunciation of these Sanskrit words, an extraordinary state of affairs exists – paralleled, I believe, in no other language in the world.' – এ মন্তব্য গ্রিয়ারসনের (Grierson 1903 : 14)। বলা যায়, অসংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে এ সংকট হয়েছে আরও বেশি। ফলে বাংলা শব্দের উচ্চারণ ও বানানের সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে কিংবা বানান বিধিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ওই ছদ্ম-সংস্কৃতায়ন তৈরি করেছে দীর্ঘমেয়াদি সংকট, পরের দুশ বছরেও যার সুরাহা হয়নি। (আজম ২০১৪ : ১৭৪)

৫. বাংলা বানানের মূলনীতি নির্ধারণ

ধ্বনিভিত্তিক বানানের বড় সুবিধা – বানান-সূত্র এখানে প্রায় অকার্যকর; অর্থাৎ বানানের সূত্র ছাড়াই বানান প্রায় অনায়াসে লেখা যায়। কিন্তু এর বড় সমস্যা হল –

অঞ্চলভেদে বানান একরকম থাকে না; আবার লিখিত রূপের চেয়ে মৌখিকরূপ দ্রুত পরিবর্তনশীল। ফলে বানানের আদল বা চেহারাও বার বার পাল্টাতে থাকবে।

অন্যদিকে ব্যুৎপত্তিমূলক বানানের সুবিধা হল – বানানের কাঠামোর মধ্যে ধরা থাকে অনেক শব্দের ইতিহাস, গঠন, রূপ-রূপান্তর, অর্থান্তরের নানা ইঙ্গিত ও সূত্র। ব্যুৎপত্তিমূলক বানানের সমস্যা এখানে যে, তা আয়াসসাধ্য এবং বানান-সূত্রের দ্বারা অধিকতর নিয়ন্ত্রিত।

দুশ বছরের বেশি সময়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ও প্রতিষ্ঠানের মত ও প্রস্তাবের ধারাবাহিকতায় বাংলা বানানের প্রচলিত ধারা, বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম দাঁড়িয়েছে। অবশ্য নিয়ম প্রণয়ন মানে এই নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে বানানের অবিকল্প রূপ তৈরি হবে। কারণ, চলমান ভাষা প্রতিনিয়ত নতুন প্রশ্ন ও দ্বিধার মুখোমুখি হতে থাকে। ধারণা করা যায়, বাংলা ভাষার রূপান্তর ঘটতে থাকবে লিপি, বানান বা লিখনরীতি – প্রতিটি ক্ষেত্রেই। তাছাড়া বানানের ধরন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে ব্যবহারকারীর আগ্রহ ও প্রয়োগের ওপরে, নিয়মের ওপরে নয়।

বানান যেহেতু মূলত লেখ্যরীতির ব্যাপার, মৌখিকরীতির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কতটুকু থাকবে, কিংবা অসামঞ্জস্য কতটুকু হবে, তা দীর্ঘদিনের প্রয়োগরীতিই নির্ধারণ করে দেয়। আমরা লক্ষ করেছি, বাংলা বানানকে পুরোপুরি উচ্চারণানুগ করে ফেলা সম্ভব নয়। আর বানানের ব্যুৎপত্তিগত রূপের প্রাধান্য আমরা কতটুকু দেব, এটি কেবল পণ্ডিতি তর্ক নয়। কারণ, বানান-ব্যবহারকারী শব্দের ব্যুৎপত্তিকে মাথার রেখে – প্রায় কোনো ক্ষেত্রে – শব্দ লেখেন না।

বর্তমান আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, সমন্বিত বানানের জন্য লিপিকাঠামো, বানানরীতি ও লিখনরীতি – তিনটি ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্য আনতে হবে। কিন্তু একইসঙ্গে আমাদের মাথায় রাখা দরকার, মূলনীতি-সাপেক্ষে বানানের সমন্বিত রূপ তৈরি করার ব্যাপারটি একান্তভাবেই কালকেন্দ্রিক; চিরকালীন বা চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। আর কোনো ভাষার জন্য চিরস্থায়ী বানান-পদ্ধতি দাঁড় করানো চূড়ান্ত অর্থে দুরূহ-প্রায় ব্যাপার। এর সবচেয়ে বড় কারণ – ভাষার পরিবর্তনীয় আচরণ। একইসঙ্গে পণ্ডিতদের বহুধা-বিভক্ত মত এবং ব্যবহারকারীর লিখন-দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, আগ্রহ ও ধরনের পার্থক্যকে এর পিছনে দায়ী করা চলে। তবে, যে-কোনো কালে বানান-সংস্কারের আগে বা বানান-রীতি প্রস্তাবের আগে এর মূলনীতি নির্ধারণ করা জরুরি। আর ভাষার সংখ্যাগুরু শব্দের বানান-কাঠামোকে যেহেতু আকস্মিকভাবে আমূল বদল ঘটানো সম্ভব নয়, সেহেতু বানানের বা বানান-পদ্ধতির ন্যূনাধিক পরিবর্তনের প্রতিটি ধাপে এর ভবিষ্যৎ গতি-প্রবাহ ও লক্ষ্যকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

টীকা

১. যে-কারণে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন থেকে বাংলা ব্যাকরণকে মুক্ত করা আমাদের অনেক লেখকের লক্ষ্য ছিল এবং আজও আছে – সেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী থেকে সাম্প্রতিককালের বহু কৃতী গবেষক পর্যন্ত।

২. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন, ১৯৯১, *বাঙ্গালা ভাষা*, পৃ. ২৯। (উদ্ধৃত, রামেশ্বর ২০০৫ : ২০০)

৩. মহাম্মদ দানীউল হক একে বানান ও উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটার কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন।

৪. একাধিক বর্ণের একরকম উচ্চারণ বাংলা বানানের একটি বড় সমস্যা। বর্ণমালার কয়েকটি ধ্বনির বেলায় এরকম দেখা যায়। যেমন –

ই, ঈ – উচ্চারণ একই কিন্তু বর্ণ দুটি। যথা : নিতি, নীতি; বাসি, বাসী।

উ, ঊ – দুই বর্ণের এক উচ্চারণ। যথা : কুল, কূল; গুড়, গূঢ়।

ঙ, ং – একই উচ্চারণ, বর্ণ দুটি। যথা : রঙ, রং; বাংলা, বাঙলা।

জ, য – উচ্চারণ একই। যথা : জাদু, যাদু।

ত, ৎ – একই উচ্চারণ। যথা : সাক্ষাৎ, সাক্ষাতকার।

ণ, ন – একই উচ্চারণ। যথা : কোণ, কোন; ঘন, গণ।

শ, ষ, স – এ তিনটি বর্ণের উচ্চারণ প্রায়শ আলাদা করা যায় না। যথা : সবিশেষ, আসা, আশা, আষাঢ়।

৫. 'পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে পূর্ব ইতিহাসের চিহ্ন বজায় রাখা উচিত। দেখা যাক, মেছনি কথাটার মধ্যে পূর্ব ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ৎ, স, এবং যফলা কোথায় গেল। ম-এ একার কোন্ প্রাচীন ব্যবহারের চিহ্ন। ন-টা কোথাকার কে। ওটা কি মৎস্যজীবিনীর ন। তবে জীবিটা গেল কোথায়। এমন আরো অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সদুত্তর এই যে, ৎ এবং স বাংলায় ছ হইয়া গেছে – এই ছ-ই ৎ এবং স-এর ঐতিহাসিক চিহ্ন, এই চিহ্ন বাংলা 'বাছা' শব্দের মধ্যেও আছে। পরিবর্তনপরম্পরায় যফলা লোপ পাইয়া পূর্ববর্ণের অকারকে আকার করিয়াছে, যেমন লুপ্ত যফলা অদ্যকে আজ, কল্যকে কাল করিয়াছে – অতএব এই আকারই লুপ্ত যফলার ঐতিহাসিক চিহ্ন। ইহারা পূর্বইতিহাসেরও চিহ্ন, এখনকার ইতিহাসেরও চিহ্ন। মাছ শব্দের উত্তর বাংলা প্রত্যয় উয়া যোগ হইয়া 'মাছুয়া' হয়, মাছুয়া শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার 'মেছো'; মেছো শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নি প্রত্যয় হইয়াছে। এই নি প্রত্যয়ের হ্রস্ব ই প্রাচীন দীর্ঘ ঈকারের ঐতিহাসিক অবশেষ। আমরা যদি বাংলার অনুরোধে মৎস্যকে কাটিয়া কুটিয়া মাছ করিয়া লইতে পারি এবং তাহাতে যদি ইতিহাসের জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে বাংলা উচ্চারণের সত্যরক্ষা করিতে দীর্ঘ ঈ-র স্থলে হ্রস্ব ই বসাইলেও ইতিহাসের ব্যাঘাত হইবে না। মুখে যাহাই করি, লেখাতেই যদি প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করা বিধি হয়, তবে 'মৎস্য' লিখিয়া 'মাছ' পড়িলে ক্ষতি নাই।' (রবীন্দ্রনাথ ২০১১/৬ : ৭৫৪-৭৫৫)

গ্রন্থপঞ্জি

অরুণ সেন (১৯৯৬)। *বানানের অভিধান* (বাংলা বানান ও বিকল্প বর্জন : একটি প্রস্তাব), ২য় সংস্করণ, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, কলকাতা

আজম, মোহাম্মদ (২০১৪)। *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, আদর্শ, ঢাকা

জামিল চৌধুরী (১৯৯০)। *বানান ও উচ্চারণ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

প্রফুল্লকুমার পান (২০০৬)। *বাংলা বর্ণপরিচয়ের দুশো পঁচিশ বছর*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

প্রমথ চৌধুরী (১৯৯৮)। *প্রবন্ধসংগ্রহ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা

মিতালী ভট্টাচার্য (২০১০)। *বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন*, পুনর্মুদ্রণ, পারুল প্রকাশনী, কলকাতা

মনসুর মুসা (২০০৭)। *বানান : বাংলা বর্ণমালা পরিচয় ও প্রতিবর্ণীকরণ*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১-১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (২৫ খণ্ড), পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

স্বরোচিষ সরকার (২০১৫)। *সর্বস্তরে বাংলা ভাষা : আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতা*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

Chatterji, Suniti Kumar (2002). *The Origin and Development of the Bengali Language*, 3rd Impression, Rupa & Co, New Delhi

Grierson, G. A. (1903). *Linguistic Survey of India* (Collected & Edited), vol. v, Indo-Aryan Family, Eastern Group, part I, Motilal Banarsidass, Delhi, Varanasi, Patna 1912, The Indian Empire, Calcutta

প্রবন্ধ ও সংকলনগ্রন্থ

কাইউম, মোহাম্মদ আবদুল (১৯৮৪)। বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

কেতকী কুশারী ডাইসন (২০০৫)। বৈদগ্ধ্যের সপক্ষে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

দানীউল হক, মহাম্মদ (১৯৯২)। বাংলা বানান ও উচ্চারণ : প্রমিতকরণের সমস্যা, *একুশের প্রবন্ধ'৯২*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

পবিত্র সরকার (২০০৭)। বাংলা বানান সংস্কার, *বানান বিতর্ক*, তৃতীয় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

মন্মথনাথ বসু (২০০৭)। ভাষার কথা, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

মৃণাল নাথ (২০০৫)। সাম্প্রতিক বানান সংস্কার : একটি সমীক্ষা, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

রামেশ্বর শ' (২০০৫)। সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা : সমন্বয়ী সূত্রের সন্ধানে, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৮৪)। বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার, *বাঙলা ভাষা*, হুমায়ুন আজাদ সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শ্রীবি (২০০৭)। বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান, *ভাষা-ভাবনা : উনিশ-বিশ শতক*, দীপঙ্কর ঘোষ সংকলিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সুধাংশুশেখর তুঙ্গ (২০০৫)। বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ, *ভাষাভাবনা*, তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা